সংবাদ

তারিখ 17 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিও বাণিজ্য নয়, চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনাভিত্তিক শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি

মো. আবদুল হাই

মহাজোট সরকারের ১০ মে'র মন্ত্রিসভার বৈঠকের খবর যখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ হলো নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষামন্ত্রীর নাজেহাল হওয়ার বিবরণী পড়ে একথাই মনে হলো এখনও কি আমরা চারদলীয় জোট সরকারের রেখে যাওয়া পথেই চলতে চাই। দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রগামী মন্ত্রণালয় হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একটি আধুনিক জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সহজ-সরল, নৈতিকতার নিক দিয়ে নিষ্ঠাবান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অটল, দুর্নীতির উর্ধ্বে যদি মন্ত্রিসভায় একজন মন্ত্রীর নাম করতে বলা হয় অকপটে সবাই বলবে বেগম মতিয়া চৌধুরী, আর তার পরের নামটিই হলো শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এমপিওভুক্তিকরণে ২০০৪ সাল থেকে ময়লা-আবর্জনার স্তূপে ভর্তি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যখন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দিলেন এমপিওভুক্তি পুনরায় শুরু করার জন্য- নাহিদ সাহসিকতার সঙ্গে এ দায়ভার গ্রহণ করেন। দায়ভার এ জন্য বলছি চারদলীয় জোট সরকারের সময় এমপিওভুক্তি ছিল নিয়োগ বাণিজ্যের রমরমা এক বাণিজ্য সেক্টর। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কেবল সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগে অটল থাকায় কেউ দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেনি। নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে চারদলীয় জোট সরকারের সময় হাত পাকানো আমলা এবং রাজনৈতিক হোমরা-চোমরা রা চেষ্টা করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে প্রাথমিক বাণিজ্য সেরে নিতে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের অবস্থান দুর্নীতির উর্ধ্বে হওয়ায় সুবিধে করতে পারেননি। বহুদিনের মধ্যে এবারই প্রথম শিক্ষক নিয়োগে বড় কোন অনিয়মের অভিযোগ নেই।

২০০৪ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজারের ওপরে। এখানে এমনও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি। কারণ বাণিজ্য। এবার ৭ হাজারের ওপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি প্রতিযোগিতায় ছিল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা মিলে এমপিওভুক্তির একটি নীতিমালা দাঁড় করান। নীতিমালা অনুযায়ী এমপিওভুক্তির দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষামন্ত্রীকে। শিক্ষামন্ত্রী তার অধীনস্ত আমলাদের নিয়ে দিন-রাত কাজ করে ১ হাজারের ওপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেন। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে, মন্ত্রিসভায় এজেন্ডা বিহীন আলোচনার সূত্রপাত করেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর নামে কলেজ এমপিওভুক্ত হয় না, অথচ ছাত্রলীগের এক সদস্য হত্যাকারী 'এনপির এক নেতার বাবার নামে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি হয়ে যায়, এরকম বক্তব্য দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। আলোচনায় যোগ দেন শিক্ষা উপদেষ্টা। তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তালিকা চূড়ান্তকরণে তার সঙ্গে পরামর্শ না করায়। উপস্থিত প্রায় সবাই তাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি না হওয়ায় [illegible] কটাক্ষ করে বক্তৃতা করেন। নুরুল ইসলাম নাহিদ বলতে চেষ্টা করেছেন নীতিমালা অনুযায়ী এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। এখানে কোন অনিয়ম হয়নি- হলে ছোটখাটো ভুল হতে পারে তথ্যগত কারণে। তার কথা কে শুনে প্রধানমন্ত্রীও পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, একসময় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রীদের এত অসন্তোষ দেখে। তালিকা পুনর্বিবেচনা করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে। তালিকার কার্যকারিতাও স্থগিত রাখা হয়। মন্ত্রিসভা কক্ষের বাইরে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ফোরামে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। রাতের দিকে গুজব ওঠে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করছেন। অবশ্য তিনি পদত্যাগ করেননি। [illegible] রাত পর্যন্ত অফিসে থেকে তালিকায় কোন গুরুতর অনিয়ম তার অজান্তে হয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখেন। সৎ সাহস নিয়ে দুর্নীতির উর্ধ্বে ওঠে যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী নিজে দায়িত্ব নিয়ে এবার এমপিওভুক্তির তালিকা করেছেন, তার মানসিক অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে।

এখানে এমপিওভুক্তি নিয়ে কিছু কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একসময় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুনিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষাবান্ধব প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। কলেজ প্রতিষ্ঠারও ঝোঁক ছিল। স্বাধীনতার আগেও এ প্রচেষ্টা শিক্ষানুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। আমার নিজের এলাকা সিলেটের বালাগঞ্জের খুজগীপুর হাইস্কুল বর্তমানে একটি নামকরা বিদ্যালয়। শ্রদ্ধেয় ললিত মোহন দে, ক্ষিতিশ বাবু, কৃষ্ণ কুমার পাল, মদরিছ আলী- তাদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে এদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য। ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত স্কুল। শিক্ষানুরাগী কটু মিয়া তার ক্ষেতের জমি ছেড়ে দেন স্কুলের জন্য বিনা পয়সায়। এমনকি তার বাবার নামে স্কুল হবে এমন আবদারও করেননি। প্রবাসী এবং ধনাঢ্য কয়জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এগিয়ে আসেন বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে। ললিত মোহন দে এবং অন্যরা বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদানে এগিয়ে আসেন। ১৯৬১-তে সরকারি 'রিকগনিশন' পায় মেট্রিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের। প্রথমবর্ষেই ১০০ শতাংশ পাস- ২টি সেকেন্ড ডিভিশন। পরের বছর একটি প্রথম বিভাগসহ ১০০ শতাংশ পাস। হইচই পড়ে গেল। ললিত মোহন দে প্রধান শিক্ষকের আনন্দ আর গর্বে বুক স্ফীত হয়ে ওঠার দৃশ্য আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তারা দেখেছি। স্বাধীনতার পরে বালাগঞ্জ কলেজ, বিশ্বনাথ কলেজ, আরও অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি প্রচেষ্টায়। সরকারের অনুদান ছিল 'রিকগনিশন'। বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যয় ছাত্র বেতন এবং শিক্ষানুরাগীদের অনুদান থেকেই চলত। এসব বিদ্যালয়ের বাইরে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল, যাদের 'এইডেড স্কুল' বলা হতো। 'এইডেড স্কুল' সরকারের আর্থিক অনুদান পেত। ১৯৭৫ পর্যন্ত এ দু'রকমের বিদ্যালয় ছিল সরকারি বিদ্যালয়ের সমান্তরাল অবস্থানে। শিক্ষানুরাগীদের সেই সুন্দর শিক্ষাবান্ধব প্রচেষ্টাকে হতদূর মনে পড়ে স্বৈরাচারী সরকারের সময় থেকে ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করা হয়। আজ যাকে আমরা এমপিওভুক্তি বলছি এটি হলো শিক্ষানুরাগীদের প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ- সরকারের পক্ষ থেকে কেবল 'রিকগনিশন' দেয়ার সেই ব্যবস্থার ভিন্নরূপ। এখন দাবি উঠছে অনুমতিপ্রাপ্ত সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করতে হবে। সড়ক অবরোধ হচ্ছে, এমপিওভুক্ত বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা জোট বাঁধছে, আন্দোলন করছে। সরকারকে হুমকিও দিচ্ছে। কারণও আছে। নির্বাচনের সময় বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নির্বাচনী সভা করা হয়েছে, আর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করার। [illegible] ব্যাপার হচ্ছে- [illegible] এমপিওভুক্তির প্রত্যাশায় [illegible] কোন [illegible] উপজেলায় ৩০/৪০টি বিদ্যালয় পড়ে উঠেছে- মাদ্রাসার সংখ্যাও এর কাছাকাছি। এ যেন কোন জমি সরকার হুকুম দখল করবে- এ খবর এক শ্রেণীর ভূমিদস্যু সরকারি কর্মচারী আগেবাগে ফাঁস করে দেয়ার মতো যাতে জমির মালিক জমিতে আধাপাকা বাড়িঘর নির্মাণ করে নেয়। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় এ বাড়িঘরকে পাকা বাড়ি দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে কয়েকগুণ। কর্মচারীরা জনহিতৈষী হিসেবে নয়- নিজেদের ঘুষের অঙ্ক বাড়িয়ে নেয়ার জন্য এটা করে। গচ্চা দিতে হয় সরকারকে। ঠিক একই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যারা রাজনৈতিক টাউট তাদের আয় ইনকাম নিশ্চিত করা, আর মন্ত্রী-এমপিদের শিক্ষানুরাগী হিসেবে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া- এখানে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের কোন লক্ষণ নেই।

এবার ৭ হাজারের ওপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করতে যেখানে প্রয়োজন ৬০০ কোটি টাকার মতো সেখানে বরাদ্দ আছে মাত্র ১০০ কোটি টাকার কিছু ওপরে। এ টাকা দিয়ে সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যাবে না, এটা সবাই জানেন। তারপরেও হইচইয়ের কারণ সহজেই বুঝা যায়। সংখ্যা যতই হোক 'আমার প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করতে হবে'। যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম- Monthly Payment Order (এমপিও) বিগত সরকারের সময়কাল পর্যন্ত ডিও ব্যবসায় রূপ নিয়েছিল। স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ প্রত্যন্ত এলাকায় প্রভাবশালী দু'একজন এবং এলাকার শিক্ষিত বেকারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিন্ডিকেট। প্রয়োজনে নিজেদের জমিতে নিজেরা চাঁদা তুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা শুরু করে, জনগণের কাছে এরা এলাকার শিক্ষানুরাগী। কিন্তু বাস্তবে নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান খড়া করে খুঁটির জোরে এমপিও নামক সরকারি অনুদান এবং বেকার যুবকদের চাকরি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম লক্ষ্য। বেকার শিক্ষক কর্মচারী তাদের চাকরি স্থায়ী হওয়ার আশায় অনেকে জায়গা-জমি বিক্রি করেও এমপিও বাণিজ্যে টাকা খাটানো শুরু করে। এ যেন শেয়ারের ব্যবসা। পুঁজি খাটালে- ঠিকমত জায়গায় খাটাতে পারলে লাভ আসবেই। এতো শুধু লাভ নয়, চাকরি পরে লাখ লাখ টাকা পেনশন গ্রাচ্যুইটিও পাওয়া যাবে। শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে এমপিও বাণিজ্য সব শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছিল। নুরুল ইসলাম নাহিদ চেষ্টা করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে একটি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক পদ্ধতিতে দাঁড় করাতে। এটা মহাজোট সরকারেরও চাহিদা। তারপরও যখন সততা ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করার জন্য একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার মতো অসহায় অবস্থায় নিয়ে যায়, সেখানে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন বিদ্ধ হয়। মহাজোট সরকারের মন্ত্রিপরিষদ নতুনদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এক রকম এডভেঞ্চার। নিজেদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার সদস্যদের অধিকাংশের কাজই এখনও চোখে পড়ার মতো নয়। অনেকেই চারদলীয় জোটের রেখে যাওয়া পথে হাঁটছেন। এমনকি '৯৬-২০০১ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকার যে যুগান্তকারী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সে পরিকল্পনাগুলোও যদি ১ বছর ৪ মাস সময়ের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হতো আজ অনেক কিছুই বদলে যেত ভূমি প্রতিমন্ত্রী এমপিওভুক্তি নিয়ে এত উচ্চবাচ্য করলেন তার মন্ত্রণালয়ে '৯৬-২০০১ সালে যে যুগান্তকারী জাতীয় কার্যক্রম তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাতে নিয়েছিলেন, তিনি কি সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেছেন? দেশের [illegible] আমলের জরিপ ব্যবস্থা। জরিপ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও অস্ট্রেলীয় সরকারের সহযোগিতায় 'ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকিকরণ' নামে একটি প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তখনও কায়েমি স্বার্থবাদী এবং ভূমি দস্যুরা এর বিরোধিতা করেছিল। চারদলীয় জোট সরকারের ভূমি দস্যুদের স্বার্থে এ প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। ভূমিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কি এ প্রকল্পের খবর রাখেন। ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, বস্তিবাসী পুনর্বাসন প্রকল্প এরকম অনেক প্রকল্প ছিল যার একটিও ১৬ মাসে লাইম লাইটে আসেনি। অথচ এগুলো সব ছিল জাতীয় [illegible] মাসে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ না করতেন আমলারা চারদলীয় জোটের অবস্থাই নিয়ে যেত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাকে।

এমপিওভুক্তিকরণ তালিকা মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন হওয়ার কথা না। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিতও হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার মন্ত্রীর। এখানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা নাক গলানোর কোন সুযোগ নেই। অন্য কোন মন্ত্রীরও নেই। তাহলে মন্ত্রিসভায় এ নিয়ে এজেন্ডা বিহীন আলোচনা এত উচ্চ মার্গে হবে কেন। হ্যাঁ- প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ যদি মনে করেন নীতিমালা যাই করা হোক না কেন- আমরা এবং মহাজোটের সংসদ সদস্যরা যে ডিও (ডিমান্ড অর্ডার) দিয়েছি সে অনুযায়ী এমপিওভুক্ত হবে শিক্ষামন্ত্রীর তো কোন বেগই পেতে হয় না। ৩০০ এমপি-মন্ত্রী উপদেষ্টা-প্রভাবশালী ব্যক্তি- তাদের ডিও দেখে দেখে সেখান থেকে মানের ক্রম অনুযায়ী ১০২২টি প্রতিষ্ঠান বেছে নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে একজন সহকারী সচিবই ছিল যথেষ্ট।

এটা কি মহাজোট সরকারের জন্য ভাল হতো, চারদলীয় জোটের এরকম কর্মকাণ্ডের পরিণতি ২০০৮-এর নির্বাচনে কি আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। জনগণ ক্ষমতার মালিক একথা মনে রাখতে হবে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ এবং মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তারা জনগণের প্রভু নন। যে কাজই করেন না কেন ক্ষমতার মালিক জনগণকে বিবেচনায় রাখবেন আশা করি। সবশেষ কথা হলো দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন। এমপিও বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থা মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করতে বা বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে কোন ভূমিকা তো রাখছেই না, উপরন্তু কিছু লোককে উপরি ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে- আর জনগণের ট্যাক্সের পয়সা শিক্ষার নামে অপব্যয় করা হচ্ছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জনকল্যাণে কাজ করবেন- এখানে দলীয় বিবেচনার অংশ থাকবে ন্যায়-নীতি আর সমতাভিত্তিক প্রবিধান। চারদলীয় জোট যা করে গেছে আপনারাও তা করবেন এটা দিন বদলের 'ডিকটাম' নয়। দলীয় বিবেচনা অবশ্যই থাকবে- তবে ন্যায়-নীতি আর সমতার ভিত্তিতে। কার নামে প্রতিষ্ঠান, কোন জেলায় কার বাড়ি সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান- এমপিওভুক্তিতে এটা বিবেচ্য হলে 'ওদের' সঙ্গে আপনাদের গুণগত পার্থক্য থাকল কোথায়। ডিও ব্যবসা সরকারের প্রথমদিকে চিনির দাম কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, নিশ্চয় মনে আছে। ডিওর মাধ্যমে শিক্ষা অনুদানকে এমপিও ব্যবসায় পরিণত করবেন না। জনগণকে দেয়া ওয়াদা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের কথা ভুলে যাবেন না। গ্রাম-গঞ্জে, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করুন, অনেকেই এমপিও কি এটা জানে না। তারা জানে এমপিও পেলেই চাকরি স্থায়ী, সরকারি স্কেলে বেতন আর অবসরে পেনশন, গ্রাচ্যুইটি। বাড়িতে [illegible] সুযোগ- সর্ব[illegible] নিশ্চিত এমপিও। এমপিও ব্যবসায় লগ্নি নিরাপদ। জায়গা-জমি বিক্রি করে হলেও শিক্ষক কর্মচারীরা বিনিয়োগে উৎসাহী। নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করে নেয়ার মহা সুযোগ।

বর্তমান সরকার যে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি কার্যকর করতে যাচ্ছে, বর্তমান এমপিও ব্যবস্থা তাতে বেমানান। পাবলিক, প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে বর্তমান (এমপিও) সরকারি অনুদানকে স্বার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী গুণমানে সমন্বয় সংযোজন সম্ভব। প্রয়োজন শুধু উদার মানসিকতার।